আন্তনি লরেৎ ল্যাভয়শিয়র

মনোতোষ চক্রবর্তী

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ ভূমিকা ॥

বিজ্ঞানের জগতে যাঁদের অবদান আজও প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রয়োজনীয় হয়ে আমাদের পথ দেখায়-ল্যাঁভয়শিয়র তাঁদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম। আজও ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর আবিষ্কারের অনেক কিছুই পড়ে। বিজ্ঞানে তাদের আগ্রহ গভীরতর হয়। অথচ তারা এমনকি আমরা বড়োরাও, তাঁর সম্বন্ধে বিশেষকিছুই জানিনা। জানার প্রয়োজনও বোধহয় বোধ করি না। তাই বাংলা ভাষায় তাঁর জীবনী পুস্তকও প্রায় দুষ্প্রাপ্য। সহজে তো নয়ই, অনেক প্রচেষ্টার পরও তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সুখ, দুঃখ, হাসিকান্নার ইতিহাস বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত ঘটনা, আমাদের অজানাই থেকে যায়। এ এক দুর্বিষহ অসহায়তা। তাঁর সমসাময়িক ঝড়ো সমাজও তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই স্বজনসহ গিলোটিনে তিনি মৃত। তাঁর উন্নত শির ভূলুণ্ঠিত।

আজ এসব কথা ভেবেই, সীমিত ক্ষমতা নিয়েই এই পুস্তক রচনা। ভালো-মন্দ বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠকজন।

মফস্‌সল শহরে, বিশ্বায়নের যুগেও, তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা যথেষ্ট কঠিন। যতটা পারা গেছে তথ্য এবং তত্ত্ব দেবার চেষ্টা করেছি—তবু অতৃপ্তির অসহায়তা রয়েই গেল। পাঠকজন নিজগুণে ক্ষমা করবেন। সঙ্গে রইল সৃষ্টিশীল কঠিন সমালোচনা দেখার বাসনা। পরবর্তী সুযোগে যাতে নিজেকে, সেই সঙ্গে পুস্তকটিকেও আরও উন্নত করা যায়। 'আধুনিক রসায়নের পিতা' সম্বন্ধে এত

সীমিত তথ্যেই পূর্ণাঙ্গতাপ্রাপ্তি হতে পারে না। এ বিশ্বাস আমার একান্তই আন্তরিক। তাই সুধীজনের উপদেশের অপেক্ষায় রইলাম।

এই পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে যাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তিনি আমার পরম উৎসাহদাতা।—বন্ধু-স্বজন, গুরুজন প্রকাশক শ্রীযুক্ত শংকরীভূষণ নায়ক। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। শুধু জানাই অন্তরের শ্রদ্ধা। তিনিই আমার মতো অলসজনকে দিয়ে বইটা লিখিয়ে নিয়েছেন। ইচ্ছে থাকলেও—এ বই কোনোদিনই লেখা হত না, যদি না তিনি এভাবে আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে আমাকে উজ্জীবিত করতেন। আমার অগণিত ছাত্র, কম্পিউটার সাথি সবার প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

অভিনন্দন গ্রন্থতীর্থের সকলকে যারা নিরলস চেষ্টায় পুস্তক প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন।

প্রতি মুহূর্তে আমি আমার বিজ্ঞান-গবেষিকা কন্যা শ্রীদ্যুতির সাহায্য পেয়েছি; তাঁর প্রতি রইল আমার অন্তরের আশীর্বাদ। এই সঙ্গে অভিনন্দন অগণিত বন্ধুজনকে যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অথচ যাদের নাম দেওয়া সম্ভব হল না।

বইটি পাঠকের ভালো লাগলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আশা করব ত্রুটি নির্দেশক সমালোচনা।

১৫ নভেম্বর, ২০১৩ মনোতোষ চক্রবর্তী

শক্তিনগর : নদিয়া

॥ প্রাক-কথন ॥

ল্যাঁভয়শিয়র রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হিসেবে পরিচিত সাধারণের কাছে এমনকি অনেক বিজ্ঞজনের কাছেও। রসায়ন বিজ্ঞানের জনক হিসাবে পরচিতি হলেও, শুধু রসায়ন বিজ্ঞানের বৃত্তেই তিনি আবদ্ধ নন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিকে আগ্রহ এবং সংপৃক্ততা তাঁকে অনন্য করে তুলেছে। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ চন্দ্র, প্রফুল্ল চন্দ্র যেমন তাঁদের পরিচিত ক্ষেত্রের বাইরেও অবাধ এবং সাবলীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, যেমন জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতায় এবং অবদানে ভাস্বরিত হয়েছেন পৃথিবীর বেশ কিছু সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী, ঠিক তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পারদর্শিতার স্বাক্ষর এবং অবদান রেখে গেছেন ল্যাঁভয়শিয়র। সত্যি বলতে কি এই জায়গায় এসেই মনে হয় আইনস্টাইনের সেই কথা যাতে বোঝা যায়— বিজ্ঞান এক মুক্ত চিন্তার ফসল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই প্রতিভা প্রতিফলিত। তাই তো এই প্রতিভাবানেরা আমাদের এতটা পূজনীয়। এতটা চিরন্তন, এতটা প্রাসঙ্গিক। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এঁদের অবদান অপরিহার্য। প্রতিভাবান ও বিজ্ঞানীদের জীবনী পাঠের অর্থই হচ্ছে জীবনকে প্রকৃতভাবে জানা। আমরা অনেকেই হয়তো জানি ল্যাঁভয়শিয়র একজন বিখ্যাত রসায়নবিদ এবং তাঁকে গিলোটিনের আঘাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানি না—অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বুৎপত্তি ও আগ্রহ। ফ্রান্সের বিপ্লব এবং উত্থানে তাঁর ভূমিকা, অনেক রসায়নবিদ/বিজ্ঞানী শুধু গবেষণাগারেই

তাঁদের জীবন কাটিয়ে গেলেন---কিন্তু ল্যাভয়শিয়র শুধু গবেষণাগারের চার দেওয়ালেই থেমে থাকেননি। একাধারে তিনি যেমন আকাদেমি অফ্ সাইন্সের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জারিত অন্যদিকে তিনি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসনের সাথেও সমান ভাবে জড়িত থেকে অংশগ্রহণ করেছেন সক্রিয়ভাবে। জীবনের ক্ষেত্রে, পরিবারের ক্ষেত্রে। সমাজের ক্ষেত্রে। সব ক্ষেত্রেই তিনি আন্তরিক এবং নিষ্ঠাবান এক ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই বহুমুখী প্রতিভা এবং জীবনের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে সফল অংশগ্রহণ অনেকের ক্ষেত্রেই ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর কারণও বোধহয় এই বহুমুখী অংশগ্রহণ এবং সফলতা। জীবনের ক্ষেত্রে, পরিবারের ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে এমনকি প্রেমের ক্ষেত্রেও। প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অংশগ্রহণ, অর্থনীতিতে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ, দেশের এবং সমাজের সংস্কারে তাঁর সদর্থক দিক নির্দেশ অনেকেরই পছন্দ হয়নি, অনেকেই বোঝেননি। আর তাই জীবনের শেষদিকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অনেকের ব্যক্তিগত শত্রুও। তাঁর জীবনও চলে গেছে এই শত্রুতাতেই আর অপছন্দতাতেই। কতদিন আর বেঁচে ছিলেন! এই অল্প সময়েই তিনি কাজ করেছেন অনেক—আর তাই আজও তিনি প্রাসঙ্গিক। আজও তিনি অপরিহার্য।

ল্যাভয়শিয়রের জীবন আলোচনায় আমরা কয়েকটি বিশেষ ভাগ দেখতে পাই, যেমন—

১. জীবন গঠন, আশা আকাঙ্ক্ষা সমাজ জীবন (১৭৪৩ থেকে ১৭৭৫)

২. বিজ্ঞান ক্ষেত্রে বিচরণ ও অবদান (১৭৭৫ থেকে ১৭৮৯)

৩. ফরাসি বিপ্লবকালীন জীবন ও জীবন অবসান (১৭৮৯—১৭৯৪)

এ সমস্ত কিছু নিয়েই এই পুস্তকে আমাদের আলোচনা।

সূচিপত্র

ল্যাঁভয়শিয়রের সমকালে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমি	১১
ল্যাঁভয়শিয়রের জীবনের প্রথম ধাপ	১৬
আন্তনি ল্যাঁভয়শিয়রের শিক্ষাজীবন	২০
বিজ্ঞান চর্চায় ল্যাঁভয়শিয়র	২৬
আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের জনক	৩৪
মেসমারিসম ও ল্যাঁভয়শিয়র	৪৫
প্রতিরক্ষা অর্থনীতি ও কৃষিক্ষেত্রে ল্যাঁভয়শিয়র	৫০
আইন প্রণেতা ও সংস্কারকের ভূমিকায় ল্যাঁভয়শিয়র	৫৫
ল্যাঁভয়শিয়রের পারিবারিক জীবন	৬১
ফরাসি বিপ্লব ও ল্যাঁভয়শিয়রের শেষ জীবন	৬৯
গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি	৭৯
কালপঞ্জি	৮০

॥ ল্যাভয়শিয়রের সমকালে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক পটভূমি ॥

পৃথিবীর জীবকূলের মধ্যে মানুষ অগ্রগতির সাপেক্ষে শ্রেষ্ঠ। আদিম যুগ থেকে সেই যে পথচলা শুরু হয়েছে তা কখনও থামেনি। থামবেও না কোনোদিন। এই পথচলা উন্নতির পথে—'উন্নয়নের রথে'। তবে মানুষের এগিয়ে চলার পথ প্রায়শই মসৃণ নয়। সব সময় তার সমস্ত চেষ্টা বাস্তবায়িত হয় না। যুগ থেকে যুগান্তরে মানুষের ইতিহাস, তার সামাজিক ইতিহাস, এই ক্রমবর্ধমান বাস্তববোধ-সঞ্জাত। বিজ্ঞানের ইতিহাস—এর ব্যতিক্রম নয়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর থালেসের সময় থেকে শুরু করে খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ বিদুষী মহিলা হাইলোসিয়ার সময় পর্যন্ত এক হাজার বছর প্রাচীন বিজ্ঞানের এক স্বর্ণময় যুগ।

বিজ্ঞান ও সমাজের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করল রাজতন্ত্র, বহুবিধ কু-সংস্কার, ভ্রান্ত ধারণা এবং কর্মবিমুখতা। সাধারণ মানুষ রাজাকে ভগবানের প্রতিভূ বলে মনে করল। তাই রাজার চাহিদামতো রাজস্ব দিত তারা। রাজা নিজে প্রজাসাধারণের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব নিতে পারেন না। তাই রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের জন্য রাজা তাঁর মনমতো কিছু লোক নিয়োগ করতেন। এই নিযুক্ত ব্যক্তিরা কালক্রমে হয়ে উঠল প্রবল পরাক্রমশালী। তাঁরাই সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে শুরু করল। কালক্রমে এই শোষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় জনসাধারণ দারিদ্রের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়াল।

ভূমিকম্প, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মহামারি, সাইক্লোন, বজ্রপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সে যুগের মানুষের জানা ছিল না। তাই তারা কু-সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ওই প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিকে ভগবানের রোষ বলে মনে করত। সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ মন্ত্র-তন্ত্রের বলে ভগবানের রোষ মুক্ত করার অছিলায় সাধারণ মানুষদের সম্পদ আত্মসাৎ করত। ফলে জনসাধারণের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকত না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কু-সংস্কার, রাজন্যবর্গের অত্যধিক শোষণের ফলে সাধারণ মানুষ নিজেদের বেশ অসহায় বোধ করত। তারা মনে করত এসমস্ত ঘটনা তাদের ভাগ্যের লিখন। চেষ্টা করলেও কোনো সুরাহা করা যাবে না। তাই তারা কর্মবিমুখ হয়ে আলস্যে জীবন কাটাত। এছাড়া ধর্মীয় কু-সংস্কার এবং রাজনৈতিক কু-সংস্কারের ফলে জনসাধারণের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কু-সংস্কারের ফলে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মহাবিশ্বে স্বাভাবিক ভাবে বিরাজমান। প্রকৃতির এই বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে মানুষ কিছু কিছু আবিষ্কার করছে। সেই সমস্ত আবিষ্কারের খণ্ড খণ্ড অংশই আমাদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

বিজ্ঞান আবিষ্কারের ইতিহাসের সূচনার কথা এখনও বোধহয় আবিষ্কারের অপেক্ষায়। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক তত্ত্বগুলি মূলত কোপার্নিকাস, গ্যালিলেও প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করেন। কোপার্নিকাস ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে এবং গ্যালিলেও ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে মোটামুটি মধ্যযুগের অবসান ঘটে। এই বছরই বিখ্যাত জ্যোর্তিবিদ বিজ্ঞানী

কোপার্নিকাস তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ De Revolution Colestium প্রকাশ করেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সাবলীলভাবে হয়নি। ধর্মান্ধদের অত্যাচারের ভয়ে কোপার্নিকাস গ্রন্থটি প্রকাশের অনুমতি দেননি। তিনি এইগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রকাশ করেন। বেশ কিছুকাল এ গ্রন্থের ব্যাপারে নীরব থেকে তাঁর জীবনের প্রায় অন্তিমকালে ৭০ বছর বয়সে উক্ত বইটি প্রকাশের অনুমতি দেন। এ সময় থেকেই আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার সুত্রপাত। অবশ্য ইতিমধ্যে মাঝে মাঝে কিছু বিজ্ঞান চর্চা হলেও তা মৌলিক কোনো সিদ্ধান্তের সন্ধান দেয়নি।

বিজ্ঞানের ইতিহাসের সূচনা পর্ব নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এই গবেষকদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত বেশি জনপ্রিয় হচ্ছে ডারউইনের মতবাদ। সেই মতবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, আদিম যুগের কোনো কোনো মহিলা উদ্ভিদ বিষয়ে বিশেষ কৌতুহলী হয়ে পড়েন। তাঁরাই শুরু করেন প্রকৃতি প্রদত্ত বীজ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া। ক্রমে মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বেড়েছে, যার ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজব্যবস্থা। দিনে দিনে মানুষের মনের বিকাশ ঘটেছে; ভালোভাবে বেঁচে থাকার বাসনা জেগেছে। তখন থেকে মানুষের চলার গতিপথ দ্বিধারায় বিভক্ত হয়েছে—কেউ চেয়েছে সামগ্রিক মানুষের কল্যাণ, আবার কেউ কেউ আত্মকেন্দ্রিকতার পথ বেছে নিয়েছে। এরাই আবার নিজ নিজ মতবাদ অনুযায়ী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছে। তাই বিজ্ঞানের গতি মসৃণ পথে এগোতে পারেনি। প্রাচীন তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে নবীন ভোরের মাঝে যে রাতের ঘন অন্ধকার, তারও রয়েছে এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস। ঠিক কোন্ সময় থেকে অন্ধকার যুগের সূচনা এবং কোন্ সময় বিজ্ঞানের নব-সূর্যোদয় তা এখনও যুক্তিনিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়নি।

খ্রিস্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতেও দু'জন ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর উল্লেখ আছে। একজনের নাম টলেমি আর-একজন হলেন গ্যালন। টলেমি আলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণা করেন অনুমানিক ১২৭ থেকে ১৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

এই দুই বিজ্ঞানীই প্রাচীন বিজ্ঞান গবেষণার শেষ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে মনে করা হয়। এর পরেই বিক্ষিপ্তভাবে বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা বিশেষ কেউ ছিল না। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় কু-সংস্কার, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, ধ্বংসাত্মক দলাদলি বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতিকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে। ফলত টলেমিই প্রাচীন বিজ্ঞানচর্চার শেষ সীমান্ত ফলক বলে মনে করা হয়। ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে থিয়োফিলাস আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় সাত শত বৎসরের পুরানো প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগারের একাংশ ধ্বংস করে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কুঠারাঘাত করে। ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে উন্মত্ত পাদ্রিদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন হাইপোসিয়া। এইসব কারণে বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রায় স্তব্ধ হয়।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রথমে ইতালি এবং পরে জার্মান, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে অর্থাৎ প্রায় সমগ্র ইউরোপে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, শিল্প-সাহিত্যের এবং সমাজ ও ধর্মসংস্কারেও আলোড়ন সৃষ্টির ঘটনা রেনেশাঁসকে আমরা দেখতে পাই।

এই সময়ে প্রতিভাবানেরা নতুন নতুন বিজ্ঞান চেতনা, শিক্ষা-ভাবনা, সমাজ ও ধর্মের মধ্যের কু-সংস্কারগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। তখনই প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে নব চেতনার আলোকে আলোকিত মানুষের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংগ্রামে যে নবীন আলোর দিশারীরা জয়ী হন তাঁরাই পরবর্তীতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই সংগ্রামে অনেককেই বহু লাঞ্ছনা ভোগ

করতে হয়েছে। এমনকি তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে ১৪০০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর লেগেছে আধুনিক পৃথিবীর আলো দেখা শুরু করতে। তবে ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দকে অন্ধকার যুগের অবসান এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনাকাল বলে মনে করা যেতে পারে।

মাছ এবং জলজ প্রাণী জলের মধ্যে বেঁচে থাকে। আমরা যারা স্থলে বাস করি তারা বায়ুর সমুদ্রে ডুবে বেঁচে থাকি। বায়ু ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু কী আছে এই বায়ুতে! একজন অসফল বিজ্ঞানী জর্জ আর্নেস্ট স্টহল (১৬৬০-১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দ) বলেন, বায়ুর মৌলিক উপাদান হচ্ছে ফ্লজিস্টন। এই তত্ত্বটির পেছনে কোনো যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছিল না। এই ভ্রান্ত তত্ত্বের আবহে রসায়ন বিজ্ঞানীরা প্রায় একশত বছর বিভ্রান্তির মধ্যে কাটিয়েছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক যোসেফ ব্ল্যাক আবিষ্কার করেন কার্বন ডাই-অক্সাইড। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে অক্সিজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন শীলি। পরের বছর অর্থাৎ ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে নাইট্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ ইউরোপের রেনেশাঁসের সময় থেকে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন ফ্র্যানসিস বেকন (Francis Bacon)। কিন্তু আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞান শুরু হয় রবার্ট বয়েল (Robert Boyle)-এর হাত ধরে (১৬২৭ থেকে ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দ)। রসায়ন বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ল্যাঁভয়শিয়রই প্রথম বাঁকটি আনলেন। অর্থাৎ ফ্লজিস্টন তত্ত্বকে নস্যাৎ করে নতুন সত্যের সন্ধান দিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন বায়ুতে আছে একভাগ অম্লজান আর চার ভাগ সোরাজানের মিশ্রণ। সুতরাং ফ্লজিস্টন তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব।